Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 01 – 09
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

মধ্যযুগের নির্বাচিত বাংলা কাব্যে নারী মনস্তত্ত্ব : প্রসঙ্গত ‘মৈমনসিংহ - গীতিকা’ এবং ‘লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না’

পূজা চক্রবর্ত্তী কুন্ডু
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : pujadeep13@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

মধ্যযুগ, বাংলা সাহিত্য, নারী মনস্তত্ত্ব, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, আত্মসম্মানবোধ, ময়নার বিলাপ।

Abstract

নারী মনস্তত্ত্বের ধারণা উত্তর ঔপনিবেশিক ভাবনার ফসল হতে পারে, তবুও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিরা কাব্যের খাতিরে যে সব নারী চরিত্র নির্মাণ করেছেন তাঁরা এক একজন এক একদিকে সম্পূর্ণা। যদিও নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করার অভিপ্রায় এক্ষেত্রে নেই, এখানে আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে এসেছে নারী মনস্তত্ত্ব। আর সেই মনস্তত্ত্বের কেন্দ্র থেকে নারী চরিত্রদের সমাজ, ও তাদের দয়িতকে দেখে নেওয়ার, পরখ করে নেওয়ার চেষ্টা কতটা কাব্যে কবিরা ফুটিয়ে তুলেছেন তা দেখার চেষ্টা করেছি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এখানে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, তা শুধু এসেছে কাহিনির প্রসঙ্গে। যে সব নারীদের এই আলোচনায় স্থান দেওয়া হয়েছে তারা নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মনস্তত্ত্বের প্রভাবে কিভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে তা-ই আলোচ্য বিষয়।

Discussion

১

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বলতেই আমাদের মনে প্রথম জেগে ওঠে যে বদ্ধমূল ধারণা তা হল সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই চর্চার বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে দেবমাহাত্ম্যমূলক গেয় কাব্য। একথা অসত্য তা নয়, তবে এটি খন্ড সত্য। মধ্যযুগের যে সময় পর্বে এপার বাংলায় (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) দেবতার গুণকীর্তণ করে কাব্য লেখার চল চলছিল, তার অনেক আগেই বৃহৎ বঙ্গের অপর প্রান্তে চট্টগ্রামে আরাকান রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল যে সংস্কৃতি, তার ফলস্বরূপ আমরা মধ্যযুগেই পেয়েছি নর-নারীর প্রেম বিষয়ক কাব্য আখ্যান। একটু বলে নেওয়া ভালো, চট্টগ্রাম নদী বন্দরকে কেন্দ্র করে যে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা কীভাবে এপার বাংলার কাব্য সাহিত্য ধারার থেকে ভিন্ন ধারার গতিপথ নিয়েছিল।

এপার বাংলায় রাজনৈতিক পটভূমিতে যখন সেন বংশ বিরাজমান, সেই সময় পর্বেই বঙ্গদেশের অপর প্রান্তে চট্টগ্রাম নদী বন্দরকে কেন্দ্র করে ব্যাবসা বাণিজ্যের সূত্রে আরব ও তৎ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মানুষজনের আগমন ঘটে। এর ফলে বাঙালি ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে এক সমন্বয় সাধন হয়। এই সমন্বয় অনেক সুন্দর ভাবে ঘটতে পেরেছিল, কারণ সেখানে কোনো আক্রমণকারী ও শোষিত শ্রেণি ছিল না। বরং ছিল পারস্পরিক সহাবস্থানের সম্পর্ক। এর ফলে ইসলাম সুফি ভাবনায় প্রভাবিত হয়ে তৎকালীন বাঙালি মুসলিম লেখকেরা কাব্য রচনা করেছিলেন। স্বভাবতই এপার বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটতে যেখানে আরও প্রায় ২০০ - ২৫০ বছর সময় লেগেছিল সেই সময় চট্টগ্রামের লোকসমাজেও গেঁথে গেছিল সুফি ভাবনা। এপার বাংলায় যে সমন্বয়ের সূত্রপাত হয়েছিল তুর্কী আক্রমণ ও লুঠতরাজের মধ্যে দিয়ে, সেখানে ইসলাম শক্তি তখন রাজশক্তি আর হিন্দুরা শোষিত। এই টানাপোড়েন কাটিয়ে উঠে cultural assimilation ঘটতে সময় লেগেছিল প্রায় ১৫০ বছর। এই সময় পর্বে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যেও আরেক সমন্বয় দেখা গেছিল, তা হল উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষের সমন্বয়। এর ফলে এপার বাংলার সমাজে তখন মানুষজনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আশ্রয়ের। এই আশ্রয়ের চাহিদা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল দেবমাহাত্ম্য মূলক কাব্য। ফলে বোঝা সম্ভব ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট বাংলাদেশের দুই প্রান্তে এক সময়কালে দুই ভিন্ন ধারার সাহিত্য চর্চার মূল কারণ।

আমাদের আলোচনার বিষয় ওপার বাংলার তৎকালীন সময়ের নর - নারীর প্রেম বিষয়ক কাব্যে নারী মনস্তত্ত্ব। নারী মনস্তত্ত্ব এই বিষয় আসলে আধুনিক কালের উত্তর ঔপনিবেশিক ভাবনার ফসল। যেখানে নারী পণ্য-ভোগ্য-পুরষের ব্যক্তিগত সম্পদ এই ভাবনার ঊর্ধ্বে গিয়ে নারীকে বুঝতে শিখিয়েছে যে সবার প্রথমে সে একজন মানুষ। তার এই পরিচিতি তাকে দেয় বেঁচে থাকার অধিকার। সমাজ তাকে চেনে নারী হিসেবে। আর ছোট থেকেই একজন মেয়ের মনে তথাকথিত নারীসুলভ যে বৈশিষ্ট্য গুলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তার নিরিখে সে নিজের অস্তিত্ব খুঁজতে থাকে। এই খোঁজার মধ্যেই ধরা পড়ে নারী মনস্তত্ত্ব।

এখন কথা হল আধুনিক যুগমানসের এই ভাবনার ছবি কীভাবে মধ্যযুগের কাব্যের মধ্যে পাওয়া সম্ভব? আসলে কাব্যের খাতিরে কবিরা এই কাব্যে নর - নারীর প্রেম কাহিনি আঁকতে গিয়ে নারীর মনস্তত্ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন, যা নারী মনস্তত্ত্ব ভাবনার সূত্রপাত বললে ভুল বলা হবে না।

আমাদের আলোচনার বিষয়ে মহুয়া, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রানী প্রমুখ নারীরা কাব্যের গণ্ডি পেরিয়ে হয়ে উঠেছে রক্ত মাংসের নারী। স্বভাবতই এর ফলে তাদের মধ্যে দেখা গেছে নারীর চাহিদা, ভাবনা। সমাজের তথাকথিত নারীসুলভ পথে তাদের জীবন গতিকে না নিয়ে গিয়ে, তারা নিজেরাই নিজেদের জীবন পথ তৈরি করেছে,ফলে তারা আর মধ্যযুগের কাব্যের নারী না থেকে, হয়ে উঠেছে আধুনিকা। যে আধুনিকা নিজেকে নিজে চেনে, নিজের অস্তিত্বকে সম্মান দেয় সবার প্রথমে, সে প্রেমে যেমন প্রেমময়ী, সিদ্ধান্তে দৃঢ়চেতা।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই জিজ্ঞাসা সব নারীর মধ্যে আসা উচিত, সেই জীবন জিজ্ঞাসা মধ্যযুগের এই আখ্যান দুটির নারীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

২

সাহিত্যে কোনো চরিত্রকে সার্থক বলতে গেলে তার আচার আচরণ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মনস্তত্ত্ব সম্মত কিনা তা বিচার্য বিষয়।চরিত্রের ব্যবহারগত কার্যকারণাত্মক যোগসূত্র যত স্বাভাবিক থাকে, চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ততই প্রকট ভাবে ধরা পরে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র প্রতিটি পালার নারী চরিত্রগুলির গতিশীলতা প্রশ্নাতীত। তবে এই নারী চরিত্রগুলির সাধারণ সাধ্যবস্তু প্রেম। এই প্রেমের দায়েই চরিত্রগুলির যা কিছু স্বকীয়তা। কখনও প্রেমে আঘাত পেয়ে নায়িকারা বিরহিনী, কখনও বা বিদ্রোহের কাঠিন্যে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, আবার কখনও প্রেমের প্রতি একনিষ্ঠতায় অটল।

"কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ"[১]

এই জিজ্ঞাসাই মহুয়ার জীবনের রক্তাক্ত পরিণতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

মহুয়ার জন্ম ও কৈশোর ঘিরে পালার সূচনা। ছয় মাস বয়সে অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়া বেদের মেয়ে রূপে পরিচিতি পায় সে। বেদের দলের সঙ্গে ঘুরে বেরালেও মহুয়ার একাকীত্বের যন্ত্রণা পাঠক মনকে স্পর্শ করে। বয়সের চাহিদায় সেও মনের মতন এক সঙ্গী চায় যাকে মনের কথা বলতে পারবে -

"এই দেশে দরদী নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরো মনের বেথা।।"[২]

মহুয়া মন-প্রাণ উজার করে ভালোবেসেছে, নিজের ভালোবাসায় গর্বিত বোধ করেছে। যে নারী আত্মসচেতন, সেই নিজের ভালোবাসাকে অপাত্রে যেমন দান করে না, তেমনই নিজের ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষা করতেও জানে। নিজের সর্বস্ব লুটিয়ে ভালোবাসতে যেমন সে পারে, আবার সেই ভালোবাসাকে প্রয়োজনে ত্যাগ করতেও পারে। ভালোবাসাকে পাওয়ার জন্য সে কঠোর তপস্যা করতে রাজি, কিন্তু তাই বলে সহজলভ্য হয়ে যায়নি নদের চাঁদের কাছে। যাচাই করতেও পিছুপা হয়নি নদের চাঁদের ভালোবাসার খাঁটিত্ব। কটু বাক্য প্রয়োগ করে পরোখ করেছে তার প্রতি নদের চাঁদের ভালোবাসার গভীরতা -

"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।"[৩]

নারী মনস্তত্ত্বে সমাজের প্রভাব বিস্তর। সমাজ নারীর সৃষ্টি করে। সমাজের প্রভাবে ব্যক্তিমানসে নারী মনস্তত্ত্ব ভাবনার সূত্রপাত হয়। তাই মহুয়ার নারী মনস্তত্ত্ব বুঝতে হলে আগে বলতে হয় সে সমাজ সচেতন এক নারী। তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ পাত্র ও বেদের কন্যার বিবাহ হওয়া যে সম্ভব ছিল না তা মহুয়া বুঝেছিল বলেই পিতার আজ্ঞায় দেশান্তরী হয়েছে, বলেছে -

"আমি যে অবলা নারী আছে কুল মান।
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান।।"[৪]

যদিও যে মহুয়া নিজেকে অবলা বলেছে সে-ই মহুয়া কিন্তু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এক নারী। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস না থাকলে ভালোবাসার মানুষের ওপর বিশ্বাস কায়েম রাখা সম্ভব না। সেই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই মহুয়া তার ভালোবাসার অজানা ভবিষ্যতের ব্যাপারে সচেতন হয়েও মনে মনে স্বামীত্বে বরণ করেছে নদের চাঁদকে। এবং সেই ভাবনা তার সইকে সে সোচ্চার কণ্ঠে জানিয়েছে।

"চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।।"[৫]

শুধু দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসী মন নয়; মহুয়ার মধ্যে দেখা যায় প্রেমজ-র প্রতি গভীর স্নেহ। প্রেম গাঢ় হলে স্নেহ অর্থাৎ বৈষ্ণব পদাবলীর 'নেহা' জন্মায়। নারী মনস্তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, নারীর এই স্নেহময়ী রূপ তার স্বভাবজাত। ভালোবাসার খাঁটিত্ব প্রকাশ পায় ত্যাগের মধ্য দিয়ে।প্রেমের প্রতি তীব্র পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে কষ্ট সহ্য করেও তাই মহুয়াকে বলতে শোনা যায়-

"আমি মরি জলে ডুব্যারে বন্ধু আমার মাথা খাও।
ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চল্যা যাও।।"[৬]

যে নারী মন মনের মানুষের চোখে সুন্দর দেখার জন্য সাজতে চায়, সেই নারীই আবার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করে প্রেমের প্রতি আকুতিকে আরও তীব্র করে তোলে।

"নিদ্রা নাই সে যায় কন্যা না ছুঁয়ে ভাত পানী।
মাথার বিষেতে কন্যা হইল পাগলিনী।।"[৭]

প্রেমের জন্য সব প্রলোভন ত্যাগ করেছে মহুয়া, কিন্তু প্রলোভনের জন্য প্রেমকে ত্যাগ করেনি। কতখানি দৃঢ়চেতা হলে কোনো নারী তার অসুস্থ পঙ্গু স্বামীকে কাঁধে তুলে পালিয়ে যেতে পারে, অসাধু সন্ন্যাসীর কামনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। এই দৃঢ়চেতা মন সে পেয়েছে বেদে সমাজের প্রভাবের ফলে একথা বলা অনুচিত হবে না,কারণ নারী মনস্তত্ত্ব বা নারী মন তৈরি হয় সমাজের প্রভাবে।

আর এই দৃঢ়চেতা স্বভাব তাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করেছে বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু লড়াই করার ইচ্ছেটাই মরে যায় যখন পিতার আদেশে প্রাণপ্রিয়কে হত্যা করার পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় সে। নিরুপায় মহুয়া বেছে নেয় নিজেকে শেষ করে দেওয়ার পথ। শেষ পর্যন্ত মহুয়া সামাজিক বন্ধনকে নয়, হৃদয়বৃত্তিকেই মর্যাদা দিয়েছে, তাই সে হুমরা বেদের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বারবার। রাজি হয়নি নদের চাঁদকে হত্যা করতে, রাজি হয়নি সুজন খেলোয়ারকে বিবাহ করতে; এমনকি পালক পিতার উদ্দেশ্যে পিতৃত্ব বোধকেও অস্বীকার করেছে মহুয়া -

"ছুট কালে মা-বাপের কুল শূন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইলে ছিলে চুরি।।
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।"[৮]

যে মহুয়ার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল "না দিব না দিব পরাণ আরও দেখি শুনি"[৯], সেই মহুয়াকে আত্মবিসর্জন দিতে হল সমাজের চাপে। এ মৃত্যু কি মহুয়ার সেই প্রতিবাদী সত্তাকেই প্রকাশ করে না? যে সমাজ মহুয়ার নারী মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছে,সেই সমাজকেই দেখিয়ে দিল মহুয়া যে, নারীর উপর চাপ প্রয়োগ করলেই সমাজ নারী মনকে চাপা দিতে পারবে না। তাই ড: দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্য একদম ঠিক–

"সে বেদিয়ার পালিতা কন্যা-এই জন্য সে বনে বনে মার্জারের ন্যায় ক্ষিপ্র, বিপদে বন্যব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীষণ।"[১০]

কোনো রকম দৈবী সহায়তা ছাড়া কুঠার দিয়ে জাহাজের তলদেশ ছিদ্র করে তা ডুবিয়ে দেওয়া, কৌশলে নিজেকে রক্ষা করা, কাঁধে নায়ককে তুলে নিয়ে পালানোর মতো শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আর কোনও নারীর ছিল না একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা সঙ্গত। মহুয়ার মনস্তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যেভাবে নারী মনস্তত্ত্বের একাধিক দিক প্রকাশিত হয়েছে কাব্যে তা আর অন্য কোনও নারী চরিত্রের মধ্যে হয়নি।

নারী ও পুরুষের কি করণীয় তা আজও বহুলাংশে ঠিক করে দেয় আমাদের সমাজ। সমাজের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে আমরা পরিচিত হই। নারীর মনস্তত্ত্ব গঠিত হয় সে কোন পরিবেশে কোন পরিস্থিতিতে বেড়ে উঠেছে তার উপর নির্ভর করে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র একটি পালার আরেক নারী চরিত্র চন্দ্রাবতী। নারী হিসেবে চন্দ্রাবতীর মনস্তত্ত্ব কেমন তা জানার জন্য পালা গানে চন্দ্রাবতী চরিত্রের যে যে দিক ফুটে উঠেছে সেগুলোর আলোচনা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ কন্যা চন্দ্রাবতী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্য এক কারণে পরিচিত, চন্দ্রাবতী প্রথম কোনো নারী যে 'রামায়ণ' রচনা করেছিল। মধ্যযুগের সমাজ জীবনে বেড়ে ওঠা কোনো নারীর পক্ষে রামায়ণ রচনার কৃতিত্ব আর কোনো নারীর নেই। সেই দিক থেকে চন্দ্রাবতী এক ও অদ্বিতীয়।

অথচ শিক্ষিত চন্দ্রাবতীও প্রথম থেকেই রামায়ণ রচনা করবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি, সেও আর পাঁচটা সাধারণ নারীর মতোই প্রাণের জয়ানন্দের সঙ্গে সংসার করতেই চেয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস ও নিজের আত্মসম্মানবোধ তাকে শিখিয়েছে ভালোবাসার মানুষের থেকে বিমুখ হতে।

জয়ানন্দের সঙ্গ যখন চন্দ্রাবতীর প্রথম ভালো লাগতে শুরু করেছিল তখন জয়ানন্দের দেওয়া পত্র সে আঁচলে বেঁধে মন্দিরের সব কাজ করেছে, নারী মনস্তত্ত্বের এক প্রধান দিক হল অন্তরের অস্থিরতা বাইরে যাতে প্রকাশ হয়ে না পরে তার প্রচেষ্টা করা। চন্দ্রাবতীও তাই করেছে। পত্র খুললেই পত্রের উত্তর দিতে হবে, কিন্তু মনের কথা মনের মানুষকে সরাসরি জানানোর উপায় নেই। সে শিক্ষিতা নারী, তাও সমাজের নিয়মে বাঁধা। পিতার অনুমতি ছাড়া জীবনের এত বড় সিদ্ধান্ত সে নিতে অপারগ, একথা পরে সে পত্রের উত্তরে জানিয়েছে -

"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী।।"[১১]

এই কারণেই প্রথমে সে পত্র পড়ার ইচ্ছে থাকলেও নিজেকে সংযত রেখেছিল। এরপরেই পিতার অনুমতিতে সেই মনের মানুষের সঙ্গে সংসার পাতার স্বপ্নে বিভোর চন্দ্রাবতীর জীবনে এল বিপর্যয়। যাকে সবচেয়ে কাছের মানুষ ভেবেছিল সেই দুরে চলে গেল, এক তথাকথিত নিম্নবর্ণের নারীর প্রেমে পরে জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে ছেড়ে চলে যায়। ভালোবাসার

মানুষের দেওয়া এই আঘাত ও অপমান সহ্য করতে না পেরে চন্দ্রাবতী শোকে পাথর হয়ে গেল। নারী মনস্তত্ত্বের আধারে নারী যেমন সহজে নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে না, তেমনই প্রকাশ করলে সেই ভালোবাসাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু সেই বিশ্বাসে যদি একবার আঘাত পায়, নিজেকে এতটাই কঠিন করে ফেলে যে আর সেই পাথর কেউ গলাতে পারে না। চন্দ্রাবতীর ক্ষেত্রেও এই এক ঘটনা ঘটল। বিশ্বাস ভাঙার এই যন্ত্রণার থেকে সে এই চরম সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে আর বিবাহ করবে না। যে চন্দ্রাবতী পিতার অনুমতি ছাড়া জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে পারবে না জানিয়েছিল, সেই চন্দ্রাবতীই জীবনের এতবড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পিতাকে তা জানায় এবং অনুরোধ করে তাকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য যাতে পিতা জোর না করে তাই।

"চন্দ্রাবতী বলে 'পিতা মম বাক্য ধর।
জন্মে না করব বিয়া রইব আইবর।।"[১২]

এর থেকেই বোঝা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো মানসিক দৃঢ়তা চন্দ্রাবতীর আছে, সঙ্গে আছে গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মন। এটাও ভারতীয় নারী মনস্তত্ত্বের এক দিক। পিতার নির্দেশে সে মহাদেবের ধ্যানে বসে, নিজেকে আরও দৃঢ় করে তোলে, সংযমী করে তোলে। রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করে। ঘটনান্তরে জয়ানন্দ নিজের ভুল স্বীকার করে পুনরায় চন্দ্রাবতীর দর্শন পাওয়ার জন্য পত্র লিখলে চন্দ্রাবতী আর সেই পত্রের উত্তর দিয়ে নিজের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন করেনি। অতীতে ফিরতে চায়নি চন্দ্রাবতীর মন। সামনে এগিয়ে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। নারী মানেই হাতের পুতুল না, যে পুরুষ তার ইচ্ছে মতো তাকে জীবনের সঙ্গে জুড়বে, আবার চাইলেই সরিয়ে দেবে। আত্মসম্মানবোধে আঘাত লেগেছিল চন্দ্রাবতীর। তাই জয়ানন্দ শেষ বারের মতো দেখতে চাইলেও চন্দ্রাবতী মন্দিরের দরজা খোলেনি। সে ধ্যানে আত্মমগ্ন হয়েছে।

"না খোলে মন্দিরের দ্বার মুখে নাহি বাণী।
ভিতরে আছয়ে কন্যা যৈবনে যোগিনী।।"[১৩]

ভালোবাসার মানুষটির থেকে সরে থাকলেও তার প্রতি ভালোবাসা কমেনি। সে যখন জানতে পারল জয়ানন্দ আর জীবিত নেই তখন আপনজন হারানোর বেদনায় যন্ত্রণা পেয়েছে চন্দ্রাবতী। উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে সে। নিজের ভালোবাসার অনুভূতিকে যেমন চন্দ্রাবতী নিজে সম্মান করেছে, তেমনি জয়ানন্দের থেকেও ভালোবাসার প্রতি বিশ্বাস ও সম্মানটাই চেয়েছে। সেই সম্মান যখন চন্দ্রাবতী পায়নি, তখন সে কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠেছে। অথচ কোনো কিছুর বিনিময়ে সে নিজেকে এবং তার ভালোবাসাকে বিকিয়ে দেয়নি জয়ানন্দের পায়ে। চন্দ্রাবতী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের মনে হতেই পারে নারীসুলভ নরম স্বভাব তার নয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। নারী মানেই সে কোমল স্বভাবের হবে এটার যেমন কোনো অর্থ নেই, তেমনি নারী মানেই সে সকল অবহেলা অপমান ভুলে গিয়ে ক্ষমা করে দেবে এমন ভাবারও কোনো কারণ নেই। চন্দ্রাবতী চরিত্রের মধ্যে আমরা নারী মনস্তত্ত্বের এই দিকটাই দেখতে পাই।

৩

দৌলত কাজী সৃষ্ট ময়না চরিত্রের নারী মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য বোধহয় কবি প্রদত্ত বিশেষণের গুরুত্ব অপরিসীম। কবি ময়নাকে চিত্রায়িত করার জন্য 'সতী' শব্দের ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে কবি এই কাব্যে দুই বিপরীত মেরুর নারী মনস্তত্ত্বের ছবি এঁকেছেন দক্ষ হাতে। চন্দ্রানীর নারী মনস্তত্ত্বের উল্টো পিঠে রয়েছে ময়নার নারী মনস্তত্ত্ব।

'সতী' অর্থাৎ যে নারী কায়মনোবাক্যে একজন পুরুষের প্রতি একনিষ্ঠ, এবং সেই পুরুষ অবশ্যই হবেন তার স্বামী। একথাও বলে নেওয়া উচিত তথাকথিত এই 'সতী' খেতাবটি নির্ধারিত হয় সমাজ কর্তৃক; সমাজ নারীমনকে সেই প্রাচীন কাল থেকেই এমন ভাবে তৈরি করেছে যাতে সে এই 'সতী' বিশেষণে বিশেষিত হবার জন্য নিজেই আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এর ফলে বহুগামী পুরুষমনের সুবিধা হয়েছে চিরকাল। এই কাব্যেও আমরা দেখি কবি স্বয়ং রাজা লোরকে এঁকেছেন বহুগামী করে, আর পুরুষজাতকে 'ভ্রমর' বলেছেন। 'ময়নার বিলাপ' অংশে দেখা যায় ময়না নিজেই একথা বলেছে-

"পুরুষ ভ্রমর কঠিন কলেবর
ভিতরে বাহিরে কালি।
যবে মত্ত মতি পুরি মনঃপ্রীতি
আর পুষ্পে করে কেলি।।"[১৪]

যাই হোক, ময়নার নারী মনস্তত্ত্ব বুঝতে হলে এই 'সতী' বিশেষণের প্রয়োজন কতটা সেটাই দেখার বিষয়। কাব্যে দেখতে পাই, লোর যখন সুন্দরী স্ত্রী ময়নাকে ছেড়ে বনবিলাসে যাচ্ছে তখন যৌবনা ময়না নিজের চাওয়া পাওয়ার হিসেব না কষে রাজ্যের ভার সামলেছে। দিনের পর দিন, মাস-বছর কেটে গেছে তার বারমাস্যা'র মধ্যে দিয়ে। অথচ চন্দ্রানী যখন তার কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল তখন তার বারমাস্যার কাহিনি সৃষ্টি করেননি কবি। এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, সতী হয়ে ওঠার জন্য সমাজ যে পরীক্ষা করে নারীকে, তা আসলে ওই সমাজে বেড়ে ওঠা নারী মন করে নিজেকেই নিজে। ময়নাকেও তাই লোর ও চন্দ্রানীর প্রেম এবং বিবাহ কাহিনি জানার পরেও সতী থাকার জন্য কবি এঁকেছেন স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতায় অটল এক স্ত্রী হিসেবে।

"কহে সুরঙ্গনা শুন সতী ময়না
ধৈর্য ধর দিন চারি।"[১৫]

হয়ত আধুনিক যুগমানসের উপযুক্ত নয় ময়নার নারী মনস্তত্ত্ব, অথচ সম্পূর্ণ অচল তাও বলা ঠিক হবে না। কারণ আজও সমাজে নারীকে সতী হিসেবেই সম্মান করা হয়। তাই সাবিত্রী, সীতা, বেহুলার সৃষ্টি করেছে সমাজ। সমাজে মালিনি ও ছাতনের মতো মানুষের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন, ময়নার মতো নারীরা নিজেদের মানসিক ক্ষমতার জোরে সেই সব প্রলোভনকে কাটিয়ে উঠতে পারে। সমাজ মানসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ময়নাই আদর্শ স্ত্রী। তাই নিজের চাওয়া পাওয়ার হিসেবের বাইরে গিয়ে সে শুধুই স্ত্রীর কর্তব্য পালন করেছে। স্বামীর ইচ্ছেকেই প্রাধান্য দিয়েছে। ময়না নিজের চাওয়া পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে সতী হয়ে উঠেছে, নারীত্বের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সে।

এরপর আসা যাক চন্দ্রানীর প্রসঙ্গে। মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কোনও পুরুষ শারীরিক ভাবে অক্ষম হলেও, তার পৌরুষত্ব না থাকলেও নারী বাধ্য হত তাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে। রাধাও এই পুরুষ শাসিত সমাজের বলি হয়েছিল। সমাজের নীতি - শৃঙ্খলের জন্য তাঁর জীবনের ইচ্ছে – আশা – কামনা - বাসনা সব জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল। আইহন নপুংসক, স্বামীর থেকে সে তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা পায়নি। তাই জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে তাকে তার ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে নিতে হয়েছিল সমাজের রক্তচক্ষুর আড়ালে থেকে। কৃষ্ণ পরপুরুষ হলেও রাধার জীবনের অমূল্য ধন সে - কৃষ্ণের স্পর্শই রাধাকে নারী করে তুলেছে।

রাধার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে আনার অন্যতম কারণ হল মধ্যযুগের কাব্য 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না' তেও এই রকম এক নারীর সন্ধান পাই যে সমাজের নীতি নিয়মের বেড়াজালে আটকে পরে বঞ্চিত হচ্ছিল- সে চন্দ্রানী। তার স্বামী বামন বীর যোদ্ধা, কিন্তু নপুংসক। তাই চন্দ্রানীও রাধার মতো স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিতা। রাধার মতো সেও ভালোবাসার কাঙাল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ইচ্ছে, চাওয়া-র কোনও দাম সমাজ দেয়না, নারীকে নিজের ইচ্ছের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজের চাহিদা পূরণ করতে হয়। চন্দ্রানীও তাই করেছে। সেও রাধার মতোই খুঁজে নিয়েছে পরপুরুষ লোরকে। কিন্তু এই কারণেই তার নারী মনস্তত্ত্বকে একালীন বলা যুক্তিযুক্ত নয়। তাকে একালের নারী বলা উচিত তখনই, যখন দেখা যায় সমাজের লোকলজ্জাকে জয় করে সে প্রকাশ্যে বামনের অক্ষমতার কথা জানিয়েছে -

"রসপুরে রসবতী স্তব্ধরূপ যেন পতি
বৃষ সঙ্গে রোহিনী বিলাস।।
বুঝিয়া স্বামীর চিত চন্দ্রানী ভাবয় ভীত।
বৃথা মোর আশ অভিলাষ।।
নর রূপ করি বিধি পাষাণ সৃজিলা যদি
তাত কি পাইনু রস হাস।।"[১৬]

মধ্যযুগের কাব্য মানেই তাতে দেবতার গুণকীর্তণ, দেবমাহাত্ম্য প্রচার- একথা সত্য নয়। আরাকান রাজসভার এই কাব্যে কোনও দেবতার প্রেম বর্ণিত হয়নি, হয়েছে নর-নারীর প্রেম বর্ণিত। চন্দ্রানী কোনও দেবী নয়, সে রক্তমাংসের মানুষ। যার সকলের মতো কামনা বাসনা আছে। অন্য আরেক দিক থেকেও চন্দ্রানীকে বিচার করা যেতে পারে, মধ্যযুগের অনেক কাব্যের নারীই অপরূপা সুন্দরী - পদ্মাবতী, ময়নাবতী প্রমুখ। কিন্তু তাদের রূপ শুধুই তাদের দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। আর চন্দ্রানীর রূপ শুধু তার দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেনি, তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতাবোধকে আলোকিত করেছে। অনন্যা করে তুলেছে তাকে। তাকে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তাই বামনের অপারঙ্গমতার কথা সরাসরি জানাতে কুণ্ঠিত হয়নি।

"পশু মতো স্বামী মোর বুঝিলুঁ ধরণ।"[১৭]

আধুনিক কালের নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে চন্দ্রানীর তার মায়ের কাছে করা 'চন্দ্রানীর খেদ' অংশের গুরুত্ব অনেকখানি। স্পষ্টভাষী চন্দ্রানীর কাছে নপুংসক স্বামীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করা নিজেকে অপমানের সমতুল্য। তার আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মসম্মানবোধ তাকে সমাজের বিপরীতে দাঁড়িয়েও জোরের সঙ্গে সত্যি বলতে প্রেরণা জুগিয়েছে। সে তার মাকে জানিয়েছে- 'শুকের সহিত ক্রীড়া না করয় বকে।'

মধ্যযুগের সমাজের চাপিয়ে দেওয়া স্বামীর বিরুদ্ধে তার খেদ প্রকাশ যেন সমাজের বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ।

"এমত না হয় যদি স্বামী ব্যবহার।
সহজে করিব শঠে শঠ সমাচার।।
ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা।
বিদ্বানেত বিদ্যা কহি মূর্খেত মূর্খতা।।"[১৮]

অথবা,

"পুনি জদি তাকে মোকে করাও মিলন।
গরল ভক্ষিয়া মুঞি তেজিমু জিবন।।"[১৯]

তবে একথা ভাবলে ভুল হবে যে চন্দ্রানী রাজার মেয়ে তাই সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। চন্দ্রানীও সমাজের বাইরের নারী নয়, বারবার বলা হয়েছে নারী মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পায় সমাজ চেতনার আলোকে। তাই একরোখা চন্দ্রানীর মুখেও আমরা সমাজের কলঙ্কের ভয়ের কথা শুনতে পাই -

"তিল সুখ লাগিয়া হারাইলুঁ জাতিকুল।
ঘাটেত বসিয়া নৌকা ডুবাইলুঁ মূল।।"[২০]

লোরের সঙ্গে চন্দ্রানী অসামাজিক কিন্তু ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, আত্মসংযমে সে অনিচ্ছুক। এর ফলে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই রকম চারিত্রিক বহুমাত্রিকতা, মানসিক দ্বন্দ্ব একালের নারী মনস্তত্ত্বের বিষয়।

এরই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করে নেওয়া প্রয়োজন যে, বামনের প্রতি চন্দ্রানীর মনোভাব প্রথম থেকেই বিরূপ ছিল না। স্বামীকে দেহমনে গ্রহণ করার আগ্রহ নিয়েই সে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দৈহিক অতৃপ্তি থেকেই বামনের প্রতি চন্দ্রানীর বিদ্বেষের জন্ম হয়। তবে বামনের প্রতি চন্দ্রানীর প্রেম না থাকুক, মানুষ হিসেবে সহানুভূতি থাকা উচিত, যা চন্দ্রানীর মধ্যে দেখা যায় না। বামনের মৃত্যুতে চন্দ্রানীকে মুহূর্তের জন্য বিচলিত হতে দেখা যায় নি। কোনও একটি বিশেষ চরিত্রকে বিশেষ গুণে গুণী করার জন্য অপর কোনও চরিত্রকে অন্ধকারে রাখা কাব্যের ধর্ম। ময়নার সতীত্বকে উজ্জ্বলিত করার জন্য চন্দ্রানীকে এই রূপ এঁকেছেন কবি। তবে আজকের পাঠক হিসেবে একথা মনে আসে, রক্তমাংসের নারীর কী শুধুই শরীরী চাহিদা থাকবে? তা কখনোই কাম্য নয়। তাই বলতে হয় চন্দ্রানী রক্তমাংসের নারী হয়ে উঠলেও নারী মনস্তত্ত্বের সবকটি দিক তার চরিত্রে প্রকাশ পায়নি, সে সম্পূর্ণ নারী হয়ে ওঠেনি। তার মধ্যে শরীর সর্বস্বতা প্রাধান্য পেয়েছে। চন্দ্রানীর এই আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে, সম্ভোগে অতৃপ্তি এর কারণ। লোরকে পেয়ে সে তৃপ্ত, মাতৃত্বে সার্থক হয়েছে তার নারী জীবন।

চন্দ্রানী ময়নাবতীর মতো আদর্শ স্ত্রী হয়নি- বলা ভালো হতে চায়নি। চন্দ্রানী নিজের জীবনকে নষ্ট করে সমাজের চোখে আদর্শ হবার ভান করতে পারেনি।সে তার জীবনকে সার্থক করার চেষ্টা করছে। আক্ষেপ করে, ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, বিধির বিধান ভেবে সে বামনকে গ্রহণ করেনি পতিরূপে। শুধু আদর্শ দ্বারা চালিত সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ এক মধ্যযুগের নারী নয় সে, সে একালের নারী, সে তার আত্মবঞ্চনাকে আত্মকেন্দ্রীকতার ভাবের দ্বারা সার্থকতায় বদলে দিতে জানে। 'Post mordanism theory 'অনুযায়ী আত্মকেন্দ্রীকতার ভাব মান্যতা পেয়েছে, এখন আর তা স্বার্থপরায়নতা ভাবা হয় না। একজন একালের নারী মনস্তত্ত্বের ভাবনায় নিজেকে নিয়ে ভাবার যে অবকাশ আছে সেই ভাবনা চন্দ্রানীর চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাই একথা বললে ভুল হবে না যে চন্দ্রানী মধ্যযুগের কাব্যের নারী হয়েও নারী মনস্তত্ত্বের বিচারে একালের নারী।

৪

উপরের আলোচনায় আমরা মধ্যযুগের কাব্যের নারী চরিত্রের লড়াইয়ের দিক দেখাতে চায়নি। সেই লড়াইয়ের পিছনে যে নারী মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে সেটাই খোঁজার চেষ্টা করেছি। নারী মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই, তাই এটি উপলব্ধির বিষয়। এই উপলব্ধি সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়। কারণ এটি সম্পূর্ণ মন ও মানসিকতা কেন্দ্রিক। আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি আধুনিক ভাবনা কিভাবে ফল্গুধারার মতো মধ্যযুগের কাব্যের নারী চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই নারী মনস্তত্ত্বই এক একটি নারী চরিত্রকে এক এক রকম ভাবে সাজিয়ে তুলেছে। আসলে আধুনিক ভাবনা তো কোনো সাল তারিখের মধ্যে আটকে থাকে না, তাই মধ্যযুগের কাব্যের মধ্যেও আমরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন দিক খোঁজার চেষ্টা করি। এটিও সেইরকম একটি খোঁজার চেষ্টা, যা ভাবতে বাধ্য করে যে মধ্যযুগের কাব্যের মধ্যেও চন্দ্রাবতী, চন্দ্রানী, মহুয়ার মতো চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যায় যারা নারী বলে শুধু দুর্বল থাকেনি। সময়ে সময়ে তারা পুরুষের থেকেও কঠোর হয়ে উঠেছে। আবার নিজের নারীত্বের খোঁজ করেছে তারাই নিজের মধ্যে। যার ফলে এই নারী চরিত্র গুলির নারী মনস্তত্ত্ব আমাদের কাছে আধুনিক বলে মনে হয়।

Reference :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ, 'মেঘদূত' কবিতা; রবীন্দ্র-রচনাবলী-ভুক্ত সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪০১, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-৫৪, পৃ. ২২৫

২. সেন, দীনেশচন্দ্র, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', 'মহুয়া পালা'; তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৫৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১

৩. তদেব; পৃ. ১২

৪. তদেব; পৃ. ১৬

৫. তদেব; পৃ. ১৩

৬. তদেব; পৃ. ১৫

৭. তদেব; পৃ. ২১

৮. তদেব; পৃ. ৪০

৯. তদেব; পৃ. ৩২

১০. সেন, শ্রী দীনেশচন্দ্র, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ষষ্ঠ সংস্করণ, পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।

১১. সেন, দীনেশচন্দ্র, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', 'মহুয়া পালা'; তৃতীয় সংস্করণ -১৯৫৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০৭

১২. তদেব; পৃ. ১১৪

১৩. তদেব; পৃ. ১১৭

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, সম্পাদিত, দৌলত কাজী রচিত 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না', প্রথম সংসদ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ-জানুয়ারী ২০০১, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১৬

১৫. তদেব; পৃ. ১৭

১৬. তদেব; পৃ. ৩৫

১৭. তদেব; পৃ. ৩৭

১৮. তদেব; পৃ. ৩৭

১৯. তদেব; পৃ. ৩৮

২০. তদেব; পৃ. ৭০

Bibliography :

আকর গ্রন্থ :

দীনেশচন্দ্র সেন : তৃতীয় সংস্করণ -১৯৫৮, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : প্রথম সংসদ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০১; দৌলত কাজির, লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯

সহায়ক গ্রন্থ :

দীনেশচন্দ্র সেন : ষষ্ঠ সংস্করণ, পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ; 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

মঞ্জুলা বেরা : প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ২০১৬, 'দৌলত কাজির সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী পর্যালোচনা বিশ্লেষণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬, 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র'; পুস্তক বিপণি, কলকাতা ৭০০০০৯

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিবর্ধিত নব সংস্করণ, ১৯৯৯, 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', প্রথম খন্ড: আদি ও মধ্যযুগ; ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা – ৭০০০০৭

সুকুমার সেন : নবম মুদ্রণ:২০১৫, 'বাংলার সাহিত্য ইতিহাস'; সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১১০০০১